বুয়েটের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বিভাগটি অবহেলিত

দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কমপিউটার শিক্ষা প্রবর্তন শুরু হয়েছে অনেক আগেই। কোথাও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আবার কোথাও স্নাতক পর্যায়ে।বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় দেশকে কমপিউটারায়নের দিকে একধাপ এগিয়ে নেবার লক্ষ্যে সর্বপ্রথম স্নাতক পর্যায়ে কমপিউটার বিভাগ খুলে। কিছুদিন আগে চালু হলো খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার সায়েন্স বিভাগ। কমপিউটার সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগটিই হচ্ছে বুয়েট তথা দেশের বর্তমানে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বিভাগ। নতুন এই বিভাগটি নিয়ে বুয়েটের কমপিউটার বিভাগের ছাত্র শিক্ষকরা কি ধরনের সমস্যা ও আশার মুখোমুখি হচ্ছেন, — তার উপর প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন— **জাকারিয়া স্বপন।**

ইতিহাস

১৯৮৪ সাল। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য জনাব মতিন পাটোয়ারীর উদ্যোগে তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক্স অনুষদের অধীনে খোলা হয় কমপিউটার ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ। তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক্স অনুষদের মাত্র চারজন শিক্ষক নিয়ে মাস্টার্স লেভেলে বিভাগটির যাত্রা শুরু হয়। তখন বিভাগটির প্রধান ছিলেন প্রফেসর মাহফুজুর রহমান। দেশে সফটওয়্যারের কথা চিন্তা করে পরবর্তীতে এর সাথে যোগ করা হয় কমপিউটার সায়েন্স। তারপর থেকেই বিভাগটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় — কমপিউটার সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ। যাত্রার প্রাক্কালে বিভাগটির অবস্থা এতই নিদারুন খারাপ ছিল যে — এর কোন কমপিউটারই ছিল না। ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমানের নিজস্ব তৈরী একটি কমপিউটারে তখন কাজ চালানো হতো।

এর দুবছর পরেই আণ্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলেও বিভাগটিকে প্রসারিত করা হয়। বর্তমানে বিভাগটি নিজস্ব একটি স্বকীয়তা অর্জন করেছে। আণ্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে চারটি ব্যাচ রয়েছে। প্রথম ব্যাচটি এখন তৃতীয় বর্ষে। আর বছর দেড়েকের মধ্যেই বাংলাদেশের প্রথম কমপিউটার বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা বেরুবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কোর্স সমূহ

বুয়েটের কমপিউটার সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের আণ্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী আন্তর্জাতিক মান সম্মত। টেবিল - ১-এ কোর্সগুলোর বিবরণ দেয়া হলো। এই কোর্সগুলো ছাড়াও এ বিভাগের ছাত্রদের নন - ডিপার্টমেন্টাল অনেক বিষয় পড়তে হয়।

শিক্ষক

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই বিভাগটি শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। দেশে দক্ষ কমপিউটার প্রযুক্তিবিদের যথার্থ অভাবের কারণেই এমনটি হয়েছে। বর্তমানে বিভাগটিতে দুজন সহযোগী অধ্যাপক আছেন। তারা হলেন - ১। বিভাগীয় প্রধান, জনাব ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান, পিএইচডি (বুদাপেস্ট, হাঙ্গেরী), এমএসসি (বুদাপেস্ট, হাঙ্গেরী)। ২। ডঃ মোঃ শামসুল আলম, পিএইচডি (ইউএসএ)।

একজন সহকারী অধ্যাপক রয়েছেন — ডঃ মোহাম্মদ কায়কোবাদ, পিএইচডি (অষ্ট্রেলিয়া), এম. ইঞ্জি. (এআইটি), এম. এস (সম্মান) ইন ইঞ্জি. (সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন)। এছাড়াও রয়েছেন আট জন প্রভাষক। প্রভাষকগণ সকলেই ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং -এ গ্রাজুয়েট। তাঁদের অনেকেই সদ্য পাশ করা।

এই বিভাগের বেশ কয়েকজন শিক্ষক ছুটিতে আছেন — যারা উচ্চ শিক্ষার্থে দেশের বাইরে রয়েছেন। তারা কবে দেশে ফিরবেন বা আদৌ ফিরবেন কি—না সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রী

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের সবচে' বেশী প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষা হয়, এতে কোনও সন্দেহ নেই। দেশের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাই বুয়েটে পড়ছে।

ডঃ মাহবুবুর রহমান এর নিজস্ব তৈরী কমপিউটার

এটা বুয়েটের একটি ঐতিহ্য। গত চারবছরের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে— ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম সারির সিংহে ভাগ ছাত্র ছাত্রীরাই কমপিউটার বিভাগে ভর্তি হয়েছে। কমপিউটার বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছাত্রীদের একটি জরীপ নিলেই ব্যাপারটি পরিস্কার হয়ে যাবে। এ ব্যাচের ৩০ টি আসন পূর্ণ হয়ে গেছে ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম ৩৪ জন ছাত্র ছাত্রীর মধ্য

টেবিল -- ১

কমপিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

আণ্ডার গ্রাজুয়েট কোর্সসমূহ

প্রথম বর্ষ

কোর্স নং	বিষয়	ঘন্টা/ সপ্তাহ
CSE-103	প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ	৩-০
CSE-104	" " ল্যাব	০-৩

এছাড়াও ৭টি ননডিপার্টমেন্টাল বিষয় রয়েছে।

দ্বিতীয় বর্ষ

CSE - 200	সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট-১	০-৩
CSE - 201	ডিসক্রীট ম্যাথ এণ্ড নিউমেরিক্যাল এনালাইসিস	২-০
CSE - 203	ডাটা স্ট্রাকচারস্ এণ্ড এলগরিদমস্	২-০
CSE - 204	" " " ল্যাব	০-৩
CSE - 205	মেশিন এণ্ড এসেম্বলী ল্যাংগুয়েজ প্রোগ্রামিং	২-০
CSE - 206	" " " " ল্যাব	০-৩
CSE - 207	সুইচিং থিউরী এণ্ড লজিকাল ডিজাইন	২-০
CSE - 208	" " " " ল্যাব	০-৩/২

এ ছাড়াও ৪টি নন ডিপার্টমেন্টাল বিষয় রয়েছে।

তৃতীয় বর্ষ

CSE - 300	সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট - ২	০-৩
CSE - 303	ডাটাবেজ এণ্ড মেনেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম	২-০
CSE - 304	ডাটাবেজ এণ্ড মেনেজমেন্ট ইনফরমেশন ল্যাব	০-৩
CSE - 305	ডাটা কমিউনিকেশন	২-০
CSE - 307	কমপিউটার আর্কিটেকচার এণ্ড অপারেটিং সিস্টেম	২-০
CSE - 309	মাইক্রো প্রসেসর এণ্ড ইন্টারফেসিং	২-০
CSE - 310	মাইক্রো প্রসেসর এণ্ড ইন্টারফেসিং ল্যাব	০-৩/২
CSE - 313	ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এণ্ড পাল্‌স টেকনিক	২-০
CSE - 314	" " " " ল্যাব	০-৩
CSE - 320	ডিজিটাল সার্কিট ডিজাইন	০-৬

এ ছাড়াও ২টি নন ডিপার্টমেন্টাল বিষয় রয়েছে।

চতুর্থ বর্ষ

CSE - 400	প্রজেক্ট এণ্ড থিসিস	০-৮
CSE - 403	কমপিউটার নেটওয়ার্কস্	২-০
CSE - 405	কমপিউটার সিস্টেম এনালাইসিস	২-০
CSE - 407	কমপিউটার গ্রাফিকস্ এণ্ড প্যাটার্ন রিকগনিশন	২-০
CSE - 408	" " " ল্যাব	০-৩/২
CSE - 409	আর্টিফিসিয়াল ইনটিলিজেন্স এণ্ড এক্সপার্ট সিস্টেম	২-০
CSE - 410	এক্সপার্ট সিস্টেম ডিজাইন (ল্যাব)	০-৩
CSE - 411	কমপিউটারস এণ্ড সোসাইটাল প্রবলেমস	২-০
CSE - 413	কমপিউটার পেরিফেরালস্ এণ্ড এপ্লিকেশন	২-০
CSE - 416	মাইক্রো প্রসেসর বেজড্ ডিজাইন	০-৩

থেকে। পরবর্তীতে অনেকে বাইরে চলে যাওয়াতে এই বিভাগের শেষ শূন্য আসনটি যে পূরন করে তার ভর্তি পরীক্ষায় মেধা স্থান ৩৯। এই ৩০ জন ছাত্রের দু'একজন ছাড়া বাকী সবাই বিভিন্ন বোর্ডে এস, এস, সি ও এইচ, এস, সি-তে মেধা স্থান অধিকারী। এই ৩০ জনের অনেকেরই বিদেশে সরকারী স্কলারশীপ ছিল — যারা স্কলারশীপ বাদ দিয়ে এ বিভাগেই লেখাপড়া করছে। টেবিল-২-এ বিশেষ কয়েকজনের ফলাফল দেয়া হলো।

এখান থেকে অতি সহজেই অনুমান করা যায় — দেশের কি রকম মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা এই বিভাগে লেখাপড়া করছে, কি বিশাল সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে বিভাগটির অন্তরালে। বাংলাদেশে আর কোনও বিষয়ে এত মেধাবী ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে না।

টেবিল - ২

নাম	বোর্ড	এসএসসি	এইচএস সি
১। মোঃ মনজুর মোর্শেদ	কুমিল্লা	১ম	১ম
২। রেজওয়ানুল কবীর	ঢাকা	১ম	৪র্থ
৩। বদরুল মুনীর সরওয়ার	ঢাকা	১৫তম	৫ম
৪। ফয়সাল আহমেদ	ঢাকা	৫ম	৯ম
৫। সালাউদ্দিন মোঃ সালিম জারের	ঢাকা	৮ম	১৬ তম
৬। শায়লা নাহিদ লুনা	ঢাকা	১১তম	১৮তম
৭। মাহবুব আলম মিয়াজী	কুমিল্লা	১৩তম	১৭ম
৮। বজলুর রহমান	যশোর	৭ম	৬ষ্ঠ
৯। শেখ ইকবাল আহমদ	যশোর	৩য়	৪র্থ
১০। কাজী ইফফাত হক	ঢাকা	৬ষ্ঠ	—

এছাড়াও প্রায় সকলেরই এস এস সি বা এইচ এস সি-তে মেধা স্থান ছিল।

বর্তমান চালচিত্র

বিভাগটির নিজস্ব মাইক্রো কমপিউটার ল্যাব রয়েছে। এতে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ টি মাইক্রোকমপিউটার রয়েছে। এছাড়াও আছে ডিজিটাল টেকনিক ল্যাব, কমিউনিক্যাশন ল্যাব, হার্ডওয়্যার ল্যাব, রোবটিক্স্ ল্যাব ইত্যাদি। বর্তমান ছাত্রসংখ্যা একশত বিশ এর কাছাকাছি। অন্য বিভাগের মতো এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেন্টাল লাইব্রেরী থেকে টাকা দিয়ে এক বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট বই ভাড়া করতে পারে। কি বই দেয়া হবে তা অবশ্য ঠিক করে দেয় বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার সেন্টার রয়েছে - যেখানে আছে বিশাল মেইন ফ্রেম এবং লাইব্রেরী। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল একটি লাইব্রেরীও আছে বটে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য ফ্যাকাল্টিতে অবশ্য আরো একটি লাইব্রেরী আছে।

তারপরেও বিভাগটির বর্তমান অবস্থা তুলে ধরার লক্ষ্যে আমরা মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর পক্ষ থেকে কথা বলি বিভাগের প্রতিভাবান কিছু ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের সাথে। তাদের এই আলোচনায় বিভাগটির চিত্র ফুটে উঠবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

মনজুর মোর্শেদ বাপী

মনজুর মোর্শেদ বাপী তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। সে কুমিল্লা বোর্ড থেকে এসএসসি ও এইচএসসি উভয়টিতে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করে। বাপী বর্তমানে রেকর্ড পরিমাণ মার্ক পেয়ে ওদের ব্যাচে প্রথম হচ্ছে। আমরা বাপীর সাথে যে আলোচনা করি, তা এখানে তুলে ধরা হলো।

কমপিউটার জগৎ : কমপিউটার কেন পড়তে আসা হলো ?

বাপী : স্কুল জীবনে টিভিতে বিদেশী ছবি দেখে কমপিউটার সম্পর্কে আগ্রহ জন্মে। এই সময় এটাকে ভৌতিক ব্যাপার মনে হতো। আমি যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন যেকোন ভাবেই হোক আমি একটা হোম কমপিউটার যোগাড় করতে সমর্থ হই। তারপর কমপিউটার সম্পর্কে আমার ধারণা পাল্টে যায়। এরপর প্রোগ্রামিং-এ ডুবে যাবার ফলে অন্য কোন সাবজেক্টে পড়ার ইচ্ছাই আমার জাগেনি। স্কুল ও কলেজে আমার পারফরমেন্স ভালো ছিল বলেই হয়তো আমি কমপিউটার পড়ার ইচ্ছাটা বাস্তবে পরিণত করতে পেরেছি। আসলে ঐ হোম কমপিউটারটিই আমাকে এপথে নিয়ে আসে।

ক. জ : এটা দিয়ে দেশের কোনও উপকার করতে পারতে- এমন চিন্তা আসেনি ?

বাপী : আমি বরাবরই নৈরাশ্যবাদী। খুব একটা আশা করিনা, এজন্যে যে, ভবিষ্যৎ সব সময় আশানুরূপ আমি পাইনি। বাংলাদেশে কিছু হবে না একথা আমি বলছি না, তবে আমার অবদান কতটা থাকবে সে ব্যাপারে আমি সন্দিহান। কারণ — আমাদের লেখাপড়ার পরিবেশ এবং আমাদেরকে যেভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে, তা আদৌ আমাদের দেশের Structure-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে।

ক. জ : পাশ করার পর কোন লেভেলে কাজ করতে আগ্রহী ?

বাপী : কাজ করার পরিবেশের কথা যদি বলা হয়, তবে বাইরের, ম্যাগাজিন পড়ে ইচ্ছেতো করেই ওখানকার সিলিকন ভ্যালীর মতো জায়গায় কাজ করি। কিন্তু ইচ্ছে করলেই যে তা পাবো, তেমন কোনও কথা নেই। তবে সরকার ইচ্ছে করলেই তা হয়তো পারেন এবং করা উচিত। কেননা আমাদেরকে যে লেভেলে তৈরী করা হচ্ছে, এবং আমাদের দেশে যে ধরনের কাজ হচ্ছে তার মধ্যে আদৌ কোনও সামঞ্জস্য নেই।

ক. জ : দেশের সীমাবদ্ধতার কথা মনে হয় না ?

বাপী : গরীব দেশ হিসেবে আমাদের হয়তো অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু এই পর্যায়ে যতটা আগ্রহ ও চেষ্টা থাকার কথা ছিল, তা দেখছি না। আমাদের দেশে গারমেন্টস্ ফ্যাক্টরী বিকাশের চেয়ে এর বিকাশ বেশী জরুরী। কমপিউটার শিল্প গড়ে তোলার ব্যাপারে তেমন কোনও মনোনীবেশ আমি এখন পর্যন্ত দেখছি না। তাই এক্ষন যে অবস্থা, তাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু করা ছাড়া আর কোনও রাস্তা দেখছি না।

ক. জ : নতুন এই প্রযুক্তি পড়তে গিয়ে কি ধরনের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ?

বাপী : প্রথম যে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তা হলো শিক্ষক সমস্যা। এটা বর্তমানে প্রকট একটি সমস্যা। আমরা যখন এই বিভাগে প্রথম ঢুকি তখন সমস্যাটা এতটা প্রকট ছিলো কিনা বুঝতাম না। কিন্তু আড়াই-তিন বছর পড়ার পর এখন ব্যাপারটা খুব জটিল সমস্যা বলে মনে হচ্ছে। এই যে আন্তর্জাতিক মানের কিছু সাবজেক্ট দেয়া হলো, যেগুলো আমাদের দেশের জন্যেও নতুন, অথচ সেই সাবজেক্টের ব্যাকগ্রাউণ্ড আছে এমন শিক্ষক রাখা হলো না — তাহলে সমস্যা তো হবেই। নতুন বিভাগ বলে এ সমস্যা কিছুটা থাকতে পারে। কর্তৃপক্ষের উচিত পাটটাইম কিছু শিক্ষক দিয়ে হলেও এ সমস্যার সাময়িক প্রকটতা হ্রাস করা।

ক. জ : শিক্ষক সমস্যাটি কিভাবে মোকাবেলা করা হচ্ছে ?

বাপী : আমরা গ্রুপ ষ্টাডি করি। নিজেরা মিলে অনেক বিষয়ই হয়তো এগিয়ে নেয়া যায়, কিন্তু বিভাগে তেমন পরিবেশও তৈরী হয়নি। এ ব্যাপারে শিক্ষকদেরও উচিত ছাত্ররা যাতে সম্মিলিতভাবে সমস্যা সমাধান করতে পারে সে ব্যাপারে এগিয়ে আসা।

ক.জ : মাইক্রো কমপিউটার ল্যাবে কি ধরণের সমস্যায় পড়তে হয় ?

বাপী : আমাদের মাইক্রো কমপিউটার ল্যাবে অনেক পিসি আছে — কিন্তু এদের মধ্যে কাজ করে মাত্র গুটি কয়েক। এদের প্রায় সবগুলোরই ড্রাইভ নষ্ট। প্রোবলেমগুলো খুবই সাধারণ- কিন্তু মেইনটেনেন্সের অভাবে এগুলোর অবস্থা করুণ। কমপিউটার কেনার পাশাপাশি এর মেইনটেনেন্সের কথাও চিন্তা করা উচিত। আমাদের ল্যাবে মেইনটেনেন্সের জন্য আলাদা কোনও ব্যবস্থা আছে কি না, সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। আমাদের কমপিউটারগুলো কেনার পর এতদিনেও ওর ড্রাইভগুলো একবার ওয়াশ করা হয়েছে কি না, কোনও রকম সার্ভিসিং করা হয়েছে কি না — আমি জানি না। একটি কমপিউটার কিনে তারপর এ রকম ধুলোবালির পরিবেশে যদি ফেলে রাখি এবং বছরের পর বছর তার কাছ থেকে সার্ভিস চাই — তবে কমপিউটারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। যদি প্রতি সপ্তাহে ড্রাইভগুলো ক্লীন করা হতো তবে আজকে এ সমস্যাটা হতো না।

ক. জ : অন্যান্য ল্যাবগুলোর কি অবস্থা ?

বাপী : আসলে একটি কমপিউটার বিভাগে যে পরিমাণ কমপিউটার হার্ডওয়্যার সুবিধাদি থাকা দরকার, আমাদের খুব সম্ভব দশ ভাগের একভাগও নেই। কমপিউটার বিভাগ হিসেবে আমাদের অন্ততঃ একটি মিনি কমপিউটারের চাহিদা থাকতে পারে - - ছোটো আমাদের নেই। কোনও 486 বেজড মেশিন নেই। দু'টো 386 মেশিন থাকলেও সেগুলো আমাদের আওতার বাইরে। সেগুলো মাষ্টার্স স্টুডেন্ট ও টিচারদের ব্যবহার করতে দেয়া হয়। আমরা মূলত : 8086 বেজড পিসির উপর নির্ভরশীল। AT মেশিনের সংখ্যাও দু'তিনটি। হার্ড ডিস্কের কথা বলাই বাহুল্য। বর্তমানে সর্বোচ্চ ৮৩ মেগাবাইট হার্ড ডিস্ক সম্পন্ন একটি কমপিউটার আছে — যেটি গত ছ'মাস ধরে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। বাকী যে দু'তিনটি পিসিতে হার্ডডিস্ক আছে তাতে আবার ফ্লপির সাথে কানেকশন নেই। ফলে আমি আমার কাজ বাইরে আনতে পারছি না।

৬০-৭০ টি পিসি একটি রুমে থাকা সত্ত্বেও লোকাল নেটওয়ার্ক নেই। আমাদের ল্যাবে একটি হাই-স্পীড প্রিন্টার আছে, যেটা ব্যবহার করতে দেয়া হয় না। নেটওয়ার্ক থাকলে এই প্রিন্টারটি ব্যবহার করে ছাত্রদের প্রিন্টার সমস্যার খুব সহজ সমাধান করা যেতো। মেইনফ্রেমে যে লাইন প্রিন্টার আছে তার প্রায় কাছাকাছি স্পীডের একটি প্রিন্টার থাকা সত্ত্বেও নেটওয়ার্কের অভাবে অথবা কোনভাবেই এটার ব্যবহার হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। আমার মনে হয় ল্যাবে এখন সর্বপ্রথম যেটা প্রয়োজন সেটা হলো — কমপিউটারগুলোর মধ্যে একটা কমিউনিকেশন সিস্টেম তৈরী করা।

আমাদের হার্ডওয়্যার ল্যাব আছে, একটা কমিউনিকেশন ল্যাব আছে, একটা রোবটিকস ল্যাব আছে। কিন্তু ল্যাবের ভেতর কি আছে জানিনা। এখন পর্যন্ত আমাদের প্রাইমারী লেভেলের মাইক্রোপ্রসেসর 8085, 8086 ব্যবহার করার সৌভাগ্যও হয়নি — বাকী 80286, 80386 এর কথাতো বাদই দেয়া যায়। অথচ থার্ড ইয়ার প্রায় শেষের দিকেই বলা যায়। আমরা কমপিউটার বিভাগের ছাত্র- অথচ আমাদের ল্যাবে ডিজিটাল মিটার মাত্র একটা। বিভাগটিকে এর চেয়ে ভালোভাবে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দেখা গেলো না।

ক. জ : বুয়েটের একটি কমপিউটার সেন্টার রয়েছে। সেখান থেকে কি ধরণের সহযোগিতা বা সুযোগ পাওয়া যায় ?

বাপী : যুক্তিযুক্তভাবে কমপিউটার সেন্টারে আমাদের বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের ফ্রি এক্সেস থাকার কথা। আমাদের ব্যাচ সম্বন্ধে আমি যেটা বলতে পারি, সে ব্যাচ বিন্দুমাত্রও তা পায়নি। আমাদের 370 মেইন ফ্রেম অ্যাসেম্বলী কাগজে কলমে করতে হয়েছে।

ক. জ ঃ কমপিউটার সেন্টারে একটি প্রসিদ্ধ লাইব্রেরী রয়েছে। এটা থেকে কমপিউটার বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা কতটা উপকৃত হচ্ছে ?

বাপী ঃ কমপিউটারের উপর যাবতীয় বই-এর এক বিপুল কালেকশন রয়েছে কমপিউটার সেন্টারের লাইব্রেরীতে। কিন্তু ওখানে আমাদের এক্সেস নেই। অথচ কমপিউটারের উপর আমরাই বেশী পাঠক।

ক.জ ঃ এই বিভাগের কি নিজস্ব কোনও লাইব্রেরী আছে ?

বাপী ঃ বিভাগের একটি লাইব্রেরী থাকা খুবই প্রয়োজন। একটি বিভাগ শুরু করার আগে যে কয়টি কমপোনেন্ট থাকতে হয় তাদের মধ্যে লাইব্রেরী অন্যতম। অথচ এই বিভাগের প্রধান কমপোনেন্টই নেই।

ক. জ ঃ বইয়ের সমস্যাটি কিভাবে সমাধান করা হচ্ছে ?

বাপী ঃ যাবতীয় বই ছেলেমেয়েরা বাইরে থেকে কিনে অথবা ফটোকপি করে পড়ে। সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে আমাদের প্রয়োজনীয় কোনও বই নেই। ইস্যু লাইব্রেরীতে যে দু'একটি আছে তা অপ্রতুল। রেন্টাল লাইব্রেরী থেকে যে বই দেয়া হয় তা আমাদের পড়ানো হয় না।

বাজারে কমপিউটারের বইয়ের দাম সবচে বেশী। তা ছাড়া একটি বিষয়ের উপর অনেকগুলো ভার্সন থাকে। এই সাবজেক্টটা এত বেশী রোলিং যে আজকে যে বইটা কিনলাম, দু'মাস পরেই বইটা বাসী হয়ে গেলো। অন্য বিভাগের ছাত্ররা একটা বই কিনলে next জেনারেশনও সেটা দিয়ে চালিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু আমরা আমাদের বই-ই কিছুদিন পর ব্যাকডেটেট হয়ে যাবার কারণে পড়তে পারি না। সেদিক থেকে চিন্তা করলে এটা খুবই ব্যয়বহুল লেখাপড়া। তাই বিভাগের নিজস্ব যদি লাইব্রেরী থাকতো, তবে রেফারেন্স হিসেবে আমাদেরকে এত টাকা খরচ করে বই কিনতে হতো না।

ক.জ ঃ আরো কোনরকম সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় কি ?

বাপী ঃ আরো একটি সমস্যা আছে। সেটি একাডেমিক। আমাদের পরীক্ষা সম্পর্কীত। এখানে প্রতিটি পরীক্ষার দু'টি পার্ট থাকে। একটি পার্ট যিনি বিষয়টি পড়ান উনিই করে থাকেন। সমস্যাটি বাধে অন্য পার্টটি নিয়ে। এই পার্টটি যিনি প্রশ্ন করেন তিনি সম্ভবতঃ ক্লাসে কি পড়ানো হয়েছে তা পূর্বোক্ত শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে নেন না। সেক্ষেত্রে যা হবার তা-ই হয়। পরীক্ষার হলে গিয়ে নতুন নতুন জিনিস দেখতে হয়।

ক. জ ঃ এখানকার ছেলেমেয়েদের পারফরমেন্স কেমন ?

বাপী ঃ আমাদের থিউরিটিক্যাল পারফরমেন্স খুবই ভালো। প্র্যাকটিক্যাল ক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে আছি।

ক. জ ঃ সরকারের প্রতি কোন রকম বক্তব্য আছে ?

বাপী ঃ আমাদের দেশের একটা ঐতিহ্য হয়ে গেছে — যে বিষয়ে যিনি নীতিনির্ধারণ করে থাকেন তিনি হন অন্য বিষয়ের আতেল, হয়তো কমপিউটারের নীতিপ্রণয়ন করবেন সাহিত্যের একজন আমলা। এটা দূর হওয়া উচিত। বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের কর্মচাঞ্চল্য প্রথম দিকে কিছুটা পরিলক্ষিত হলেও, এখন এর ভূমিকা কি তা বোধগম্য নয়। সরকারের এই পর্যায়ে যতটা উৎসাহ থাকা উচিত ছিল সেটুকু পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এটা যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই মঙ্গল।

ক. জ ঃ সাবজেক্ট হিসেবে কমপিউটার কেমন ?

বাপী ঃ এটা এতই বেশী মজার সাবজেক্ট যে, আমি অন্য কোন বিষয়ের টেস্ট (স্বাদ) নেবার কথাও কখনো ভাবিনি। এর প্রতি আগ্রহ ক্রমবর্ধমান।

ক. জ ঃ এত সমস্যার মাঝেও অনুপ্রেরণা কি ?

বাপী ঃ এত সমস্যার মাঝেও এ কথা বলা যায় — এ বিভাগের অনেকেই আন্তর্জাতিক মানের সফটওয়্যার তৈরীর যোগ্যতা রাখে। নিজেকে আমি ঐ পর্যায়ে ভাবতে পারছি -- এতে বিভাগের অবদানটাই বেশী। এ ছাড়া আরেকটি কথা না বললেই নয় — তা হলো, এখানে ছাত্রদের মধ্যে সহযোগিতা ও হৃদ্যতা ঈর্ষণীয় রকম সুন্দর ও গভীর। দেশের সব ভালো ছাত্রছাত্রীরা এখানে জড়ো হয়েছে বলে এটা হয়ে থাকবে। এই পরিবেশটা আমার খুবই ভালো লাগে। ভালো লাগে নিজেকে দেশের প্রথম কমপিউটার গ্র্যাজুয়েট ভাবতে।

কাজী ইফফাত হক

কাজী ইফফাত হক কমপিউটার সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। সে ঢাকা বোর্ডে এস, এস, সি-তে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করে। ভর্তি পরীক্ষায় ইফফাত মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। তাদের ব্যাচে তার বর্তমান মেধাস্থান দ্বিতীয়। কমপিউটার বিভাগের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আমরা তার সাথেও কথা বলি।

ক. জ ঃ যে কোন সাবজেক্ট পড়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কমপিউটারে পড়ার কারণ কি

ইফফাত ঃ কমপিউটার বিষয়টিই নতুন। আর আমাদের দেশে তো আরো নতুন বলা যায়। নতুন একটি সাবজেক্ট, যেটা বর্তমান বিশ্বে সবচে, বেশী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে — তাই আমি এই সাবজেক্টে ভর্তি হই। তখন মনে হয়েছিলো নতুন কোনও অবদান রাখতে পারবো।

ক. জ ঃ দেশের উন্নয়নের কথা মনে হয় না বা হয়নি ?

ইফফাত ঃ ভর্তি হবার সময় ততটা বুঝে উঠতে পারিনি। তবে এখন মনে হচ্ছে আমরা পাশ করে বেরুলে আমাদের ছেলেমেয়েরা দেশে খুব ভালো অবদান রাখতে পারবে।

ক. জ ঃ কমপিউটার বিভাগের ল্যাব সুবিধা কেমন ?

ইফফাত ঃ আসলে আমরা যখন প্রথম ঢুকি, তখন মাত্র ৪/৫ টি কমপিউটার ছিল। তার উপর দুটি ব্যাচ। লাইন দিয়ে কাজ করতে হতো তখন। এখন তো প্রচুর কমপিউটার এসেছে। পূর্বের অবস্থাটা আমরা কাটিয়ে উঠেছি।

যদিও আমরা প্রচুর পরিমাণে পিসি পেয়েছি, কিন্তু বর্তমানে ঐ পিসিগুলোর প্রায় সবগুলোই ড্রাইভ খারাপ হয়ে পড়ে আছে। কমপিউটার বিভাগ হিসেবে আরো সাপোর্ট থাকা উচিত ছিল। এই সাপোর্টের অভাবেই আমাকেও ব্যক্তিগতভাবে কমপিউটার কিনতে হয়েছে।

ক. জ ঃ বিভাগটিতে আর কি ধরণের সমস্যা রয়েছে ?

ইফফাত ঃ প্রিন্টার সমস্যা একটা বড় সমস্যা। একটা মাত্র প্রিন্টার। তাও ঠিকমতো কাজ করে না। রিবন ব্যবহার করতে দেয়া হয় না। হয়তো ব্যয়বহুল তাই। হার্ডডিস্কসহ কমপিউটারগুলো আমাদের ব্যবহার করতে দেয়া হয় না। এটা ব্যবহার করতে দেয়া উচিত। ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেমেয়েরা ওগুলো নষ্ট করে ফেলতে পারে। কিন্তু সেকেণ্ড ইয়ার থেকে ওগুলো ব্যবহার করতে দেয়া উচিত।ক. জ ঃ ডিজিটাল ল্যাব সম্পর্কে মন্তব্য কি ?

ইফফাত ঃ এই ল্যাবে আরো ইনডিভিজ্যুয়ালী কাজ করার সুযোগ দেয়া উচিত। ৬/৭ জনের একটি গ্রুপে ছোট্ট একটি ব্রেড বোর্ডের উপর মাত্র একজনই কাজ করতে পারে। বাকীরা শুধু দেখে যায়। সেক্ষেত্রে লেখাটা ফলপ্রসূ হয় না।

ক. জ ঃ শিক্ষক সমস্যা সম্পর্কে মন্তব্য কি ?

ইফফাত ঃ সেকেণ্ড ইয়ার পর্যন্ত তেমন একটা অসুবিধা হয়নি। কিন্তু থার্ড ইয়ারের কিছু কিছু সাবজেক্ট খুব সমস্যা সৃষ্টি করেছে। শিক্ষকের অভাবে কিছু সাবজেক্ট ইতিমধ্যেই বোরিং হয়ে উঠেছে। অথচ কমপিউটার খুবই মজার সাবজেক্ট।

আমাদেরকে প্রচুর কষ্ট করে সাবজেক্টটা বুঝতে হচ্ছে। তবে একটি কি দু'টি ব্যাচ বের হয়ে গেলে এ সমস্যার অনেকটা সমাধান হবে।

ক.জ ঃ পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে কোন বক্তব্য আছে ?

ইফফাত ঃ আমাদের বিভাগের শিক্ষকরা স্টেবল না। তারা জয়েন করার কিছুদিনের মধ্যেই বিদেশ চলে যান। সেক্ষেত্রে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র উল্টাপাল্টা হয়ে যায়।

ক.জ ঃ এত সমস্যার মাঝেও আশার কথা কোনটুকু ?

ইফফাত ঃ আসলে নতুন একটা বিভাগ চলছে, এটাই শুভকথা। আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। গরীব দেশ। দেশের প্রায় সবস্থানেই শিক্ষা ব্যবস্থা থিউরিটিক্যাল। সেদিক থেকে আমরা খুব একটা খারাপ নেই। তবে আশার কথা হচ্ছে — দেশের সব ভালো ভালো স্টুডেন্টরা এই বিভাগে ভর্তি হচ্ছে।

এ ছাড়াও বিভাগটি ছোট্ট হওয়াতে — খুব সুন্দর একটি পরিবেশ রয়েছে। কমপিউটার ডে পালন করা, কোন শিক্ষককে ঘটা করে বিদায় জানানো, কমপিউটারের ভাষায় কথা বলা — বেশ মজার ও আনন্দের। সবার মাঝে যে একটা হৃদ্যতা আছে, তা অন্য বিভাগে নেই। সময়টা ভালো কাটে।

ক. জ ঃ কমপিউটার বিভাগে এত ভালো ভালো ছাত্র-ছাত্রীদের আসা উচিত কি ?

ইফফাত ঃ অবশ্যই। এটা মাথা খরচের সাবজেক্ট। আমার মনে হয়, মিডিওকার স্টুডেন্টরা এখানে এসে তেমন কিছু করতে পারবে না। সাবজেক্টটাতে ক্রিয়েটিভিটির প্রচণ্ড সুযোগ। এর প্রতিটা দরজা খোলা। ভালো করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। ভালো স্টুডেন্টরা অবশ্যই ভালো কিছু তৈরী করতে পারবে। যাদের নিজস্ব চিন্তাশক্তি আছে এবং খুব তাড়াতাড়ি কিছু বুঝার ক্ষমতা আছে কেবল তাদেরই উচিত এ লাইনে আসা।

বদরুল মুনীর সরওয়ার

বদরুল মুনীর সরওয়ারও একজন যথার্থই কৃত ছাত্র। সে ঢাকা বোর্ড থেকে এসএসসি-তে ১২তম এবং এইসএসসি-তে ৫ম স্থান অধিকার করে। কমপিউটার বিভাগে সে এবার তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। তার সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরার জন্য আমরা তার মুখোমুখি হই।

কমপিউটার জগৎ ঃ কমপিউটার কেন পড়া হচ্ছে ?

মুনীর ঃ ছোটবেলা থেকেই আমার ইঞ্জিনীয়ার হবার ইচ্ছা ছিল। কমপিউটার বিশ্বের আধুনিক প্রযুক্তি। একসময় জানলাম এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন খুব তাড়াতাড়ি সম্ভব। বোর্ড পরীক্ষায় কিছুটা হলেও সাফল্য ছিল বলে আমি আমার ক্ষুদ্র মেধা দেশের কাজে লাগানোর কথা ভাবি। সেই রঙ্গিন স্বপ্ন নিয়েই কমপিউটার বিভাগে পড়তে আসা।

ক.জ ঃ এখনও কি মনে হচ্ছে, পর্যাপ্ত অবদান রাখা যাবে ?

মুনীর ঃ এ ব্যাপারে আমি খুবই আশাবাদী। উচ্চ শিক্ষার কথা চিন্তা করে যেহেতু এ বিভাগটি খোলা হয়েছে — আমার মনে হয় এখান থেকে পাশ করা ছাত্রছাত্রীরা বেশ ভালো অবদান রাখবে।

ক. জ ঃ বুয়েটের কমপিউটার বিভাগে পড়াশুনা করতে গিয়ে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখিন হতে হচ্ছে ?

মুনীর ঃ শিক্ষক সমস্যা আমাদের সবচে' বড় সমস্যা। দেশে নিশ্চই কমপিউটারের উপর কিছু হলেও দক্ষ লোক আছেন। তাদেরকে দিয়ে কেনো ক্লাস করানো হচ্ছে না, ব্যাপারটি বোধগম্য নয়।

ক. জ ঃ এ সমস্যা কি ভাবে সমাধান করা হচ্ছে ?

মুনীর ঃ আমরা গ্রুপ স্টাডি করে আপাততঃ এ সমস্যার সমাধান করছি। এর জন্যে আমাদেরকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে। আমাদের ইফিসিয়েন্সি কমে যাচ্ছে। একজন দক্ষ শিক্ষক সাবজেক্টটা পড়ালে হয়তো সহজবোধ্য ও ইন্টারেস্টিং হতো, কিন্তু সে ক্ষেত্রে এখন অনেক সাবজেক্টই কঠিন ও বোরিং মনে হচ্ছে।

ক. জ ঃ বিভিন্ন ল্যাবে কি ধরণের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় ?

মুনীর ঃ প্রথমত ঃ মাইক্রো কমপিউটার ল্যাবের মেজিমাম পিসিগুলো অকেজো। ল্যাবের প্রিন্টার সমস্যা আরো একটি বড় সমস্যা। একটি মাত্র প্রিন্টার। ওটা নিয়ে ভীড় পড়ে যায়। একটি মাত্র প্রিন্টার দিয়ে কাজ চালানো সত্যিই দুরুহ। এসাইনমেন্ট জমা থাকলে সবাইকেই খুব বিপদে পড়তে হয়। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোনও হার্ডডিস্ক সম্পন্ন কমপিউটার অনুমোদন করা হয় না। ওগুলো শিক্ষক ও মাস্টার্স স্টুডেন্টদের জন্যে রক্ষিত। আমরা নাকি ওগুলো নষ্ট করে ফেলবো। তিন বছর কমপিউটারের উপর পড়াশুনা করার পর যদি শুনতে হয় — আমরা মেশিন ব্যবহারে অযোগ্য — তবে এরচে' লজ্জার আর কি থাকতে পারে। তাই একসময় রাগে দুঃখে নিজেই কমপিউটার কিনে ফেলি।

আমাদের হার্ডওয়্যার ল্যাবের অবস্থা আরো করুন। ডিজিটাল টেকনিক ল্যাবে ছ'-সাত জনের গ্রুপে কাজ করতে হয়। তাও প্রয়োজনীয় চিপ পাওয়া যায় না। প্রায় সময়েই দেখা যায় ত্রুটিপূর্ণ IC-এর জন্যে experiment মিলে না। আমরা মাইক্রোপ্রসেসর বেজড যে ডিজাইনগুলো করি- তা তাত্ত্বিক। থিউরিটিক্যালি একটি সার্কিট সাউণ্ড হতে পারে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালী তা কাজ নাও করতে পারে। ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ হিসেবে এ ব্যাপারটি খুব তাড়াতাড়ি সমাধান করা উচিত।

আরেকটি ব্যাপার- এখানে শুধুমাত্র ডস শেখানো হয়। অন্য কোনও অপারেটিং সিস্টেম শেখানো হয় না। অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় নন ডিপার্টমেন্টাল সাবজেক্ট কমিয়ে হলেও অন্য অপারেটিং সিস্টেম (যেমন জেনিক্স) সিলেবাসভুক্ত করা উচিত। এ ছাড়াও আমাদের ইণ্ডাস্ট্রীয়াল টুরও থাকা উচিত যেটা বুয়েটের অন্যান্য বিভাগে রয়েছে।

যদিও কথাগুলো নেগেটিভ, তবুও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কাজে লাগবে মনে করেই বলতে হচ্ছে।

ক. জ ঃ এই বিভাগে বইয়ের সমস্যা কেমন ?

মুনীর ঃ টাকা হলে অবশ্য বইয়ের সমস্যা খুব একটা থাকে না। বাজারে মোটামুটি বই পাওয়া যায়। যেগুলো পাওয়া যায় না, সেগুলো ফটোকপি করে নিলেই চলে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বইয়ের ব্যাপারে আমরা কোনরকম হেল্পই পাই না। রেফারেন্স বইগুলোও আমাদের কিনতে হয়। অনেকসময় বাজারে কপি কম থাকে। তখন তাড়াহুড়ো করে প্রতিযোগিতা করে বই কিনতে হয়। আমাদের বিভাগের নিজস্ব একটি লাইব্রেরী করার উদ্যোগ একবার নেয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত ব্যাপারটি হয়ে উঠেনি। নিজস্ব লাইব্রেরী থাকলে ছাত্র-ছাত্রীরা একটা বিরাট মুক্তি পেতো। বাংলাদেশের অন্যকোনও বিভাগে এত খরচ করে পড়তে হয় বলে আমার জানা নেই। অথচ সরকার এদিকে কমপিউটারায়ন বলে চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছে।

ক. জ ঃ সাবজেক্ট হিসেবে কমপিউটার কতটা মজার ?

মুনীর ঃ আমার মতে এটা সবচে মজার সাবজেক্ট। যে কোন লোক যদি ৩ দিন কমপিউটারে কাজ করে তবে সে কমপিউটারের প্রেমে পড়ে যেতে বাধ্য।

ক. জ ঃ এত সমস্যার মাঝেও আশা কোনটুকু ? প্রেরনা কোনটি ?

মুনীর ঃ বিভাগটির ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক খুবই চমৎকার। সম্ভবতঃ ছোট বিভাগ বলে এটি হয়েছে। লেখাপড়ার পরিবেশটি সুন্দর। ক্লাসমেটদের মাঝে প্রচণ্ড বন্ধুসুলভ মনোভাব। আর প্রেরণা হলো — একদিন নিশ্চই এসব প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠা যাবে। দেশকে দ্রুত কমপিউটারায়নের পথে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাবো।

বিভাগীয় প্রধান
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান

কমপিউটার সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলাপ করে আমরা অনেক প্রতিকূলতার কথা জানতে পারি। তাই আমরা পুরো ব্যাপারটি খোলামেলা ভাবে দেখার জন্যে মুখোমুখি হই অত্র বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমানের। উনার সাথে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো।

ক. জ ঃ আপনার বিভাগে শিক্ষক সমস্যা এত প্রকট কেন ?

মা. রহমান ঃ শিক্ষক পাওয়া যায় না। আমরা এডভার্টাইজ করি। কিন্তু কোনও এপ্লিকেশন পড়ে না।

ক. জ ঃ কেন এপ্লিকেশন পড়ে না বলে আপনার মনে হয় ?

রহমান ঃ লোকজন নাই।

ক. জ ঃ তারমানে আপনি বলতে চাচ্ছেন দেশে উপযুক্ত লোক নেই।

রহমান ঃ হয়তো কিছু কিছু লোক আছেন, কিন্তু বিভিন্ন সুবিধাদির অভাবে হয়তো তারা জয়েন করতে আসেন না।

ক. জ ঃ ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন কি ?

রহমান ঃ এখানে সবচে' বড় যে সমস্যা তা হলো, আমেরিকাতে যারা পড়তে যান তারা ফিরে আসেন না। আমাদের নিজস্ব শিক্ষক যারা আমেরিকায় পড়তে গেছেন তারা ফিরে আসেননি। আনঅফিসিয়ালী আমি শুনেছি — তাদের কেউ কেউ লেখাপড়া কমপ্লিট করে ওখানেই চাকুরীতে ঢুকে গেছেন। আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে তারা ফিরবেন না। এ রকম অনেক শিক্ষকই পোস্ট দখল করে রেখে ছুটি নিয়ে বাইরে পড়তে গেছেন। নতুন শিক্ষক নিয়োগে এটাও একটা বাধা বটে। তারপর যদিও আমরা লোক চাই তখন কেউ দরখাস্ত জমা দেন না।

আরেকটি দিক হলো, আমরা কিছু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক মাঝে মাঝে পেয়ে থাকি, যারা এখানে জয়েন করতে চান। যেমন একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। বেল ল্যাবরেটরী থেকে একজন বাংলাদেশী আমাকে জানালেন তিনি দেশে ফিরতে চান। বিশ্ববিদ্যালয় তাকে চাকুরী দেবে কি না ? এখন উনারা হলেন সিনিয়র লেভেলের লোক। হয়তো বেল ল্যাবে ৮/৯ বছর কাজ করেছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম আছে, বিভিন্ন পোস্টের জন্যে বিভিন্ন বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সেদিক থেকে উক্ত লোকদেরকে হয়তো লেকচারার বা এসিস্টেন্ট প্রফেসর — এ সকল পোস্টে নিয়োগ দিতে হয়। কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতা হয়তো প্রফেসর লেভেলে। সেক্ষেত্রে উনারা আসতে চান না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি এক্ষেত্রে প্রধান বাধা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো একটি অলিখিত নিয়ম রয়ে গেছে যেটা আরো বড় বাধা। নিয়মটি হলো, কেউ যদি দেশের বাইরে থেকে ডিগ্রী নিয়ে সরাসরি জয়েন করতে চান তবে, তার ঐ ডিগ্রী নেবার সময়টুকু বিবেচনায় আনা হয় না। ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করি। যেমন ধরুন, দু'জন একই সাথে পাশ করে একজন চলে গেলেন পিডিবি-তে আরেকজন হয়তো গেলেন বিদেশে উচ্চ শিক্ষার্থে। পিডিবিতে ১ম জন হয়তো চার বছর চাকুরী করলেন। অন্যজন বিদেশে এই চারবছরে পিএইচডি শেষ করলেন। এখন দু'জনই যদি বুয়েটে জয়েন করেন, তবে বিদেশের ঐ চারবছর ২য় জনের জন্য জিরো, ওটা কাউন্ট হবে না। কিন্তু পিডিবিতে চারবছর চাকুরী করলেন, এটা আবার কাউন্ট হবে। এখন পিডিবির লোকটি যদি বুয়েটে জয়েন করে আবার বিদেশে চলে যান এবং আরো চারবছরে পিএইচডি করে ফেরেন তখন তার পুরো আট বছর কাউন্ট করা হবে। তারমানে যে নিজের ইচ্ছায় পিএইচডি করে এলেন, এটা তার কোনদিন কাউন্ট হবে না। এরকম বহু কেস এই বুয়েটেই আছে। এটা আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশনের মধ্যে নেই। তবুও নিয়মটি এখনো টিকে আছে।

ক.জ ঃ স্টুডেন্টরা বলেছে, মেইনটেনেন্সের অভাবে আপনার বিভাগের অনেক পিসি অকেজো পড়ে আছে।

রহমান ঃ মেইনটেনেন্সের জন্য আমরা চেষ্টা করছি। কিন্তু এর প্রতিকারটা দ্বিমুখী। একটা দিক হলো — সাধারণভাবে মেইনটেনেন্স তো করা হবেই। কিন্তু পাশাপাশি স্টুডেন্টদেরও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হবে। আমি এ ব্যাপারটিকেই জোর দিতে চাই। স্টুডেন্টদের আরো রেগুলেটেড ওয়েতে কাজ করা উচিত।

ক. জ ঃ ছেলেমেয়েদের প্রিন্টার সমস্যা রয়েছে।

রহমান ঃ আসলে আমাদের ১০/১২টি প্রিন্টার আছে। কিন্তু সেগুলো দেয়া যাচ্ছে না। যেমন ল্যাবের বর্তমান প্রিন্টারটির তার-টার ছিড়ে একেবারে পঙ্গু করে রেখেছে। প্রচণ্ড টানাটানি না করলে কানেকশন তার ছিড়ে ফেলা সহজ কাজ নয়। কিন্তু স্টুডেন্টরা যদি রেগুলেটেড ওয়েতে এই কাজগুলো করতো তবে আমরা অন্য প্রিন্টারগুলোও দিতে পারতাম। দেয়ার সাথে সাথেই যদি নষ্ট করে ফেলা হয়, তবে কিভাবে দেবো। আমাদের তো একটা লিমিটেশন আছে।

নতুন একটা বিভাগ খুলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত ছিল এককালীন কিছু অনুদান দিয়ে বিভাগটিকে দাঁড় করানো। সেরকম কিছু এখানে হয়নি। পরিমিত টাকা দিয়েই আমাদের চলতে হয়। আস্তে আস্তে আমাদের এগুতে হচ্ছে। স্টুডেন্টদের এটা বুঝা উচিত।

ক. জ ঃ প্রশাসন কড়াকড়ি হলে নিশ্চই এ ধরণের ক্ষতির সম্মুখিন হতে হতো না ?

রহমান ঃ আমরা যদি খুব টাইট দেই, প্রতিটা স্টুডেন্ট-এর পেছনে লেগে থাকি, তবে স্টুডেন্টরা কাজ করে মজা পাবে না। আমরা বিশ্বাস করি, স্টুডেন্টরা স্বাধীনভাবে নিজের মতো কাজ করবে। অবশ্য আমার ধারনা শুটি কয়েক স্টুডেন্ট-এর জন্যেই এ ধরণের ক্ষতিটা হচ্ছে। স্টুডেন্টরা নিজেরা যদি সিরিয়াস থাকে, তবে সবদিক দিয়ে তাদেরই লাভ। তাই আমি বলবো — এ সবের একমাত্র প্রতিকার, স্টুডেন্টরা রেগুলেটেড ওয়েতে কাজ করবে।

ক. জ ঃ এখন অবস্থাটা এমন যে, ইকুয়েপমেন্ট থাকা সত্ত্বেও ছাত্ররা তা ব্যবহার করতে পারছে না। এডমিনিস্ট্রেশন করা হলে ছাত্ররা কিছু জিনিসতো ব্যবহার করতে পারবে। আপনি ২য়টিকে সাপোর্ট করছেন না কেন ?

রহমান ঃ হ্যাঁ, প্রশাসন কড়াকড়ি করলে ছাত্রদের কিছু বাড়তি সময় নষ্ট হয় বটে, কিন্তু সবাই কিছু নতুন জিনিস পাবে। ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।

ক.জ ঃ আপনাদের বিভাগের লাইব্রেরী নেই কেনো ?

রহমান ঃ বুয়েটের কোনও বিভাগেরই লাইব্রেরী নেই। ফ্যাকাল্টির একটি লাইব্রেরী রয়েছে। ওখানে ছাত্র-ছাত্রীরা ইচ্ছে করলে পড়তে পারে। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীও আছে। অবশ্য কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে আমাদের তেমন কোন বইও নেই। ওদেরকে বার বার বলা সত্ত্বেও কেনো যে বই কিনছে না বুঝতে পারছি না।

ক. জ ঃ কমপিউটার সেন্টারের যে লাইব্রেরী আছে, সেখানে কমপিউটার বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের এলাও করা হয় না কেন ?

রহমান ঃ এটা এডমিনিস্ট্রেটিভ ব্যাপার। তবে কোনও স্টুডেন্ট যদি এপ্লিকেশন করে তবে তার লাইব্রেরী ব্যবহারের অনুমতি দেয়া উচিত। কমপিউটার সেন্টারের লাইব্রেরীতে

যে বই আছে, তার উৎকৃষ্ট ও কার্যকরী পাঠক হলো কমপিউটার স্টুডেন্ট। এমন অনেক বই ওখানে আছে যেগুলো অন্যান্য লোকরা বুঝবেও না। লাইব্রেরীর বহুল ব্যবহারের সুযোগ অবশ্যই থাকা উচিত। ক. জ ঃ আপনি কি স্টুডেন্টদের পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট ? আপনার কাছে আশার আলো কতটুকু ?

রহমান ঃ বিভাগে এত ভালো ভালো স্টুডেন্ট ভর্তি হয়, তাদের কারো কারো রেজাল্ট সেটিসফ্যাক্টরী। এর মাঝেও দু'একজন ছাত্র খারাপ করলে কষ্ট হয়।

এত সীমাবদ্ধতার মাঝেও যে বিভাগটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে চলছে, এটাই আমার কাছে আশার কথা।

ক. জ ঃ সরকারের প্রতি আপনার কোনও বক্তব্য আছে ?

রহমান ঃ সরকার চেষ্টা করছে দেশকে কমপিউটারায়নের পথে এগিয়ে নিতে। কমপিউটার কাউন্সিল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠি লিখছে কমপিউটার বিভাগ খোলার জন্য। চিঠিতো সবাই লিখতে পারে। কিন্তু তারজন্যে প্রয়োজনীয় সাহায্যের হাতও প্রসারিত করা উচিত। সরকারের উচিত অদক্ষ লোক নিয়ে কমপিউটার বিভাগ নতুন করে না খোলা। একটি বিভাগকে শক্তিশালী করে তারপর সেখানকার প্রডাক্টকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া যেতে পারে। তাহলে দেশে সুষ্ঠু কমপিউটারায়ন হতে পারে। কোন কাজ শুধুমাত্র শুরু করলেই তো চলবে না, তাকে ধরেও রাখতে হবে।

ক. জ ঃ বুয়েট থেকে স্কুল পর্যায়ে একটি পাইলট স্কীম হাতে নেয়া হয়েছিল, যাতে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা কমপিউটার শিখতে পারে। সেটার বর্তমান অবস্থা কি ?

রহমান ঃ হ্যাঁ এরকম একটি উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকার ১৪টি স্কুলকে ট্রেনিং- ব্যবস্থার পাকাপাকি পরিকল্পনা নিয়েছিলাম। প্লানিং কমিশন এ ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য দেবে বলেছিলো। কিন্তু কমপিউটার কাউন্সিলের জন্য এটা হয়ে উঠেনি। তারা বললো, ওটা তারা দেখবে। তারপর ওটা ভেস্তে গেছে।

ক.জ ঃ দিল্লীর পালামে এই জানুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে প্রিয়দর্শিনী কলেজ অব কমপিউটার সায়েন্স। আমেরিকার একটি সোসাইটি একে ৬০ লক্ষ ডলার দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে থেকে দান হিসেবে পাওয়া যাবে ১ কোটি ডলার, বিনিময়ে ঐ সমস্ত দেশের কিছু কিছু ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কলেজটি প্রশিক্ষণ দেবে। বাংলাদেশে এরকম কিছু কি সম্ভব নয় ?

রহমান ঃ অবশ্যই সম্ভব। তবে সরকারী পর্যায়ে এর উদ্যোগ নিতে হবে। দিল্লীর ঐ কলেজটির প্রতিষ্ঠাতা জনাব আলী সিদ্দিকী। বাংলাদেশেও হয়তো ঐরকম ইমেজের কিছু লোক আছেন। তারা যদি এগিয়ে আসেন, তবে এ ধরণের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশেও হতে পারে। কিন্তু সেজন্যে চাই ব্যক্তিচিন্তার উর্ধ্বে সামগ্রিক চিন্তা।

ক. জ ঃ কমপিউটার বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আপনার বক্তব্য কি ?

রহমান ঃ এরা পাশ করে বের হলে, দেশে নিশ্চই একটি জোয়ার আসবে। এরাই হবে দেশের নিজস্ব প্রথম কমপিউটার বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ। বিদেশেও এরা প্রচুর সাফল্য কুড়াবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

যে দেশের সবচে' ভালো ছাত্ররা আসবে, তাতে আমাদের কোনও সন্দেহ ছিল না। এটা একটা নতুন বিভাগ এবং পৃথিবীতে এর বিশাল চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশেও কমপিউটারের চাহিদা অনেক। আমরা সে চাহিদা এখনও পূরন করতে পারছি না। আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। তবে আমাদের এই কমপিউটার বিভাগের ছাত্ররা যারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দু' টোতেই ব্যুৎপত্তি লাভ করবে তাদের যে চাহিদা থাকবে, তা সবার উপরে, তাতে আমার কোনও সন্দেহ নাই। প্রথম থেকেই ধারণা ছিলো — শিক্ষকের অভাবটা ভালো ছাত্ররা নিজেরাই কিছুটা পূরণ করে নিতে পারবে।

দেশের সবচে' মেধাবী ছেলেরা যেহেতু এখানে পড়ছে, তাই আমি বলছি— এরা পাশ করে বের হলে, এদের পঞ্চাশ ভাগও যদি দেশে থাকে, তবে দেশে এটা পরিবর্তন আসবে, একটি জোয়ার তৈরী হবে। এবং সেসব চিন্তা করেই আমরা আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম করেছি এবং আমার মনে হয় আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম ছাড়া দেশে দ্রুত কমপিউটারায়ন সম্ভব নয়। এবং এসব ছাত্ররা ইনিশিয়ালী হয়তো কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হবে, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তরিকতা থাকলে খুব সহজেই এগুলো সমাধান করা সম্ভব।

সম্ভাবনাময় কেন

দেশে বর্তমানে কমপিউটার বিজ্ঞানী নেই বললেই চলে। দেশকে কমপিউটারায়নের পথে এগিয়ে নিতে এরাই হবে নেতৃত্বদানকারী সৈনিক। এখানকার ছেলেমেয়েরা ইতিমধ্যেই সফটওয়্যারের উপর বেশ দক্ষতা দেখিয়েছে। এদের অনেকেই বর্তমানে ঢাকার কিছু কমপিউটার প্রতিষ্ঠানে পার্টটাইম কাজও পেয়েছে। সেক্ষেত্রে তারা প্রতিষ্ঠানের আস্থাও অর্জন করেছে। আরেকটি ব্যাপার লক্ষ্যণীয় যে, এই বিভাগের কিছু ছাত্রছাত্রীকে সিঙ্গাপুরের একটি কমপিউটার প্রতিষ্ঠান চাকুরী দেবার ব্যাপারে ইতিমধ্যেই আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

বুয়েটের ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড ইলেক্ট্রনিক্স বিভাগ থেকে পাশ করে অনেক ছাত্র বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তর কমপিউটার প্রতিষ্ঠানগুলোতে (যেমন ইনটেল, বেল ল্যাব ইত্যাদি) প্রচণ্ড সাফল্য দেখিয়েছে— যাদের কমপিউটারের উপর তেমন কোনও গ্রাফ ধারণাই ছিল না। সুতরাং বুয়েটের কমপিউটারের উপর গ্রাজুয়েটরা বিশ্বের কমপিউটার জগতেও যে তুলকালাম কাণ্ড বাধাবে, সেটা অবধারিত।

দেশে কমপিউটার শিল্প বিপ্লব ঘটাতে এরাই হবে অগ্রনী। কমপিউটারকে ব্যবহার করে দেশ যে বিশাল অর্থনৈতিক মুক্তি পেতে পারে, সে ব্যাপারে আজ আর কোন দ্বিমত নেই। যেমন, ডাটা এন্ট্রির ব্যাপারে দেশে এখন বেশ আলোড়ন পড়ে গেছে (এজন্য ম্যাসিক কমপিউটার জগৎ-এর রিপোর্টিং-এর কৃতিত্বই পুরোপুরি)। তাই সরকার এ বিভাগটির ছাত্রছাত্রীদেরকে কাজে লাগিয়ে খুব সহজেই দেশে কমপিউটার শিল্প গড়ে তুলতে পারেন।

শেষকথা

বাংলাদেশের প্রযুক্তিগত লেখাপড়া প্রায় সকলক্ষে